(ক) বৈশিষ্ট্য

নাটক সাহিত্য-পরিবারের এমন একটি শাখা, অভিনয়যোগ্যতাই যার প্রধান গুণ এবং এই কারণে সাধারণভাবে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলেই অভিহিত করা হয়। আবার এমন নাটকও রচিত হতে পারে, যার সাহিত্যগুণই প্রধান, পাঠেই পূর্ণ তৃপ্তি লভ্য হতে পারে, অভিনয়ে পূর্ণ রসের স্বাদ পাওয়া যায় না। নাটক গদ্যে রচিত হতে পারে, পদ্যেও রচিত হতে পারে; গদ্য-পদ্য উভয়ের সম্মিলনেও উৎকৃষ্ট নাটক সৃষ্টি সম্ভব। নাটক গীত-বহুল হতে পারে, নৃত্যযুক্ত হতে পারে, আবার উভয় উপাদানের অনুপস্থিতিতেও নাটক সার্থক হতে পারে। এ থেকে দেখা যায়, সাহিত্যের তিনটি ধারার মধ্যে নাটকেই বৈচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগ সর্বাধিক। স্বভাবতই যিনি কবি এবং বিশ্বকবিরূপেই আমরা যাঁকে অভিহিত করে থাকি, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু নাটক রচনায় প্রায় সর্বাধিক বৈচিত্র্যেরই সার্থক নিদর্শন রেখে গেছেন, অপর কোনো নাট্যকারের রচনায় এত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

❑ **বস্তুনিষ্ঠতার অভাব ঃ** রবীন্দ্র-নাটকে শুধু একটি গুণেরই অভাব দেখা যায়, এটি হল নাট্যকারের নির্লিপ্ততা বা একান্ত বিষয়মুখিতা। সংস্কৃত নাটক, প্রাচীন গ্রিক নাটক এবং অনাধুনিক য়ুরোপীয় নাটকে এই বিষয়মুখিতা বা বস্তুনিষ্ঠা (objectivity) নাটকের প্রধান গুণ বলে বিবেচ্য হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনেই এর পরিবর্তন ঘটেছে। নাট্যকারগণও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে নাটকে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন—য়ুরোপীয় নাটকে ইব্‌সেন, বার্নার্ড শ' প্রভৃতির নাটকেও তাঁরা নির্লিপ্ত থাকতে পারেননি। আবার মেটারলিঙ্ক, ইয়েট্‌স প্রমুখ নাট্যকারগণ রূপক-সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে তাদের উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "....সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনেই নাটকের প্রাচীন লক্ষণ, প্রাচীন সংজ্ঞা বদলাইয়া গিয়াছে, প্রাচীন রূপ এবং ভঙ্গিমাও বিবর্তিত হইয়া অন্য রূপ ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে। নাট্যমঞ্চও সেই নূতন আদর্শের রূপ দিতেছে। এই দিক হইতেই রবীন্দ্র নাটক বিচার্য। তাহা ছাড়া সাহিত্য-মূল্যের দিক হইতেও ইহাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।"

নাটকেও কবির মন্ময়তা বা আত্মোপলব্ধির প্রবণতাকে সংরক্ষণপন্থী সমালোচকগণ মেনে নিতে পারেননি, এটিকে তাঁরা ত্রুটি বলেই বিবেচনা করেন। এই কারণেই কাব্যের সর্ববিধ শাখায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা স্বীকার করেও অনেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনাকে স্বধর্ম-বিচ্যুতি বলেই মনে করে থাকেন এবং এই কারণেই তাঁদের নিকট রবীন্দ্রনাথের নাটক পূর্ণ স্বীকৃতিলাভে বঞ্চিত। এই স্বধর্মবিচ্যুতি কেবল ভাবের ক্ষেত্রে নয়, নাটক রূপায়ণের ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের চরিত্রগুলিও স্বরূপে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ওইগুলি অর্ধেক মানব, অর্ধেক কবির ভাবকল্পনা মাত্র। প্রবীণ সুধী রসজ্ঞ সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন, "নাট্যকলা যে তাঁহার শিল্পস্বধর্মরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার একই বিষয়ের উপর লেখা নাটকের মুহুর্মুহু রূপ ও ভাবকেন্দ্রের পরিবর্তনে।.....রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নাট্যকার-সত্তা ছিল, সেই সত্তা সর্বদাই পরীক্ষা-বিব্রত, শিল্পীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপ সুষমার অনুসন্ধানে অস্থির। এমন কি যে রূপক-নাট্যে তাঁহার কবিপ্রকৃতির সহিত সর্বাধিক একাত্ম, সেখানেও তিনি নূতন নূতন কল্পনার অঙ্কুশ-তাড়িত, নূতন ভাবকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত, নূতন ভাঙ্গা-গড়ার নেশায় রূপ-নির্মিতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত। তাঁহার

Scanned with CamScanner

মন্ময়তা এত প্রবল যে তিনি নাটক লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই—তাঁহার নরনারী এক একটি মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদেহী চেতনার এক একটি অর্ধপরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পর্যবসিত। অসম্পূর্ণ প্রয়াসের খণ্ডাংশ-বিকীর্ণ বাংলা নাটকের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত, কিন্তু রূপের দিক দিয়া অসমাপ্ত খণ্ডমূর্তিগুলি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।"

❑ **অভিনয়যোগ্যতার অভাব ঃ** কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও রবীন্দ্র-নাটকের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, সামান্য কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ রবীন্দ্র-নাটকেরই অভিনয়যোগ্যতা নেই। কারণ, এতকাল ধরে 'সক্রিয়তা' বা action-কে নাটকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু অধিকাংশ রবীন্দ্র- নাটকে এই সক্রিয়তার একান্ত অভাব, তার পরিবর্তে পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনের সাহায্যেই নাটকের নাটকীয়তা প্রকাশ পেত। এই বাচিক অভিনয় দর্শক সাধারণের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট ছিল না। ফলে অধিকাংশ রবীন্দ্র-নাটককেই সাধারণত পাঠযোগ্য বলে মনে করা হত—এদের নাট্যাভিনয়ে মঞ্চসাফল্য লাভ করা যাবে না বিবেচনায় অনুরূপ প্রচেষ্টাই বস্তুত পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রমাণিত হয়েছে যে, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই এতকাল অধিকাংশ রবীন্দ্র-নাটক মঞ্চসাফল্য লাভ করেনি, দোষটা রবীন্দ্র-নাটকের নয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। অথচ এগুলির অভিনয় যোগ্যতা নিয়ে কেউ বড়ো একটা প্রশ্ন তোলেনি।

(খ) নাট্যাবলী

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাটক রচনাও শুরু হয়েছিল, কাজেই নাটক রচনায় তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না, এমন কথাও বলা যায় না। আর তাছাড়া বিষয় বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে এবং সংখ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের নাটক নিতান্ত নগণ্য নয়। নীচে যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের নাটকের নাম তালিকাবদ্ধ করা হল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' বাংলা ১২৮৭ সনে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৮) নাট্যকাব্যরূপে অভিহিত হলেও আসলে এটি গীতিকাব্য। পরবর্তী নাটক ঃ 'কালমৃগয়া' (১২৮৯ সন), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১), 'নলিনী' (১২৯১), 'মায়ার খেলা' (১২৯৪), 'রাজা ও রানী' (১২৯৬), 'বিসর্জন' (১২৯৭), 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯), 'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩), 'কাহিনি' (১৩০৬), 'হাস্যকৌতুক' এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৩১৪), 'শারদোৎসব' (১৩১৫), 'মুকুট' (১৩১৫), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬), 'রাজা' (১৩১৭), 'ডাকঘর' এবং 'মালিনী' (১৩১৮), 'বিদায় অভিশাপ' এবং 'অচলায়তন' (১৩১৯), 'ফাল্গুনী' (১৩২২), 'গুরু' (১৩২৪), 'অরূপরতন' (১৩২৬), 'ঋণশোধ' (১৩২৮), 'মুক্তধারা' এবং 'বসন্ত' (১৩২৯), 'গৃহপ্রবেশ' এবং 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২), ১৩৩৩ সনে রচিত হয় 'শোধবোধ', 'নটীর পূজা', 'রক্তকরবী' এবং 'ঋতু উৎসব', 'ঋতুরঙ্গ' (১৩৩৪), 'শেষরক্ষা' (১৩৩৫), 'পরিত্রাণ' এবং 'তপতী' (১৩৩৬), 'নবীন' (১৩৩৭), 'শাপমোচন' (১৩৩৮), 'কালের যাত্রা' (১৩৩৯), 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ' এবং 'বাঁশরি' (১৩৪০), 'শ্রাবণগাথা' (১৩৪১), নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৩৪২), 'চণ্ডালিকা' (১৩৪৪) এবং 'শ্যামা' (১৩৪৬)। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'মুক্তির উপায়' (১৩৫৫ সন)। অর্থাৎ, সর্বজাতীয় নাটকের সংখ্যা মোট পঞ্চাশের কাছাকাছি।

❑ **রূপান্তরিত নাটক ঃ** পূর্বোক্ত তালিকায় রবীন্দ্রনাথের যে সকল নাটকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি অপর কোনো নাটকেরই সংস্কারকৃত রূপ, যেমন—'রাজা' নাটকের পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন' আবার 'শারদোৎসব' নাটকের পরিবর্তিত রূপ 'ঋণশোধ'। রবীন্দ্রনাথের অপর কিছু নাটক উপন্যাস কিংবা ছোটোগল্প থেকে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন—'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' কিংবা 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধ'। রবীন্দ্রনাথ নাটক নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাদের মধ্যে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এক অনন্যসাধারণ কীর্তিরূপে স্বীকৃত।

Scanned with CamScanner

■ **রবীন্দ্র-নাট্যের শ্রেণিবিভাগ :** রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র নাটকের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে আলোচনা করা যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের নাটকে বৈচিত্র্য এত বেশি এবং একটি থেকে অপরটি এতই পৃথক যে, শ্রেণিবিন্যাসে মতভেদ একান্তই স্বাভাবিক। যাহোক, বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করছি : (এক) গীতিনাট্য, (দুই) রীতিসিদ্ধ নাটক, (তিন) নাট্যকাব্য, (চার) কৌতুকনাট্য, (পাঁচ) রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক ও (ছয়) নৃত্যনাট্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, সাধারণত দেখা গেছে যে, রবীন্দ্রনাথ যখন এক জাতীয় একটি নাটক রচনা করেছেন, তখন সেই ধারার অনুসরণে পরপর কয়েকটি নাটকই রচনা করেছেন। নাটকের এক একটি প্রকরণ যেন তাঁকে এক এক সময় পেয়ে বসে। অবশ্য এই ধারার ব্যতিক্রমও রয়েছে যথেষ্ট।

■ [এক] গীতিনাট্য

❖ **বাল্মীকি প্রতিভা :** কাব্য রচনার সূচনা-পর্বেই রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলে যে নাটকগুলির সৃষ্টি হল তাদের মধ্যে রয়েছে—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এটিকে 'গীতিনাট্য' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।" ছন্দবিহীন এই নাটকটিতে সুরের বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। দেশি সুর এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সদ্য-আহৃত বিলিতি সুরের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার এই নাটকটিকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা দান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায় অনেকবার অভিনয় করেছেন। 'বাল্মীকির কবিত্বলাভ'—রামায়ণের এই কাহিনিটিই নাটকটির উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'বাল্মীকি প্রতিভা' বিষয়ে বলেছেন, "এই দেশি ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দেশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। .....বস্তুত 'বাল্মীকি প্রতিভা' পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে। উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে।.....ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই.....। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান-সঙ্গত রীতিমত সঙ্গীত নহে।"—এই নাটকে বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব বর্তমান।

❖ **রুদ্রচণ্ড :** প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এ সময় রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' নামে যে কাব্যটি রচনা করেছেন, তাতে সংলাপরীতি গৃহীত হলেও এবং 'নাট্যকাব্য'রূপে পরিচিত হলেও এটি একটি 'গীতিকাব্য'। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,—"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন।" এই গ্রন্থটির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হয় 'রুদ্রচণ্ড'। 'রুদ্রচণ্ড' নাটকের সংলাপ রচিত হয়েছে কবিতায় এবং এতে সংগীতেরও বহুলতা রয়েছে। সেই হিসেবে এটি 'গীতিনাট্য' কিংবা 'নাট্যকাব্য'রূপে আখ্যাত হতে পারত, কিন্তু তা না করে এটিকে 'নাটিকা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব প্রাকরণিক দিক থেকে বলতে গেলে 'রুদ্রচণ্ড'-ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন, "রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুরে আসিয়া 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য (১৮৭৩, মার্চ) রচনা করেন এই 'রুদ্রচণ্ড' তাহারই নাট্যরূপ।" নাটকটির কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যমূল্য নেই।

❖ **কালমৃগয়া :** 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সার্থকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় অপর একটি গীতিকাব্য রচনা করেন 'কালমৃগয়া।' রামায়ণেরই অপর একটি সুপরিচিত কাহিনি—দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির

Scanned with CamScanner

পুত্র বধ এই গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু। এক সময় রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলি থেকে 'কালমৃগয়া' নির্বাসিত হয়েছিল এবং এর অনেকগুলি গান 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। রস আস্বাদনের বিচারে এটি 'বাল্মীকি প্রতিভা'র তুল্য হয়ে উঠতে পারেনি।

❖ **প্রকৃতির প্রতিশোধ ঃ** 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্র-নাটকের প্রথম পরিমিত রূপ। এটিকে 'গীতিনাট্য' পর্যায়ভুক্ত করা হলেও এর পরিচয়ে এটিকে 'নাট্যকাব্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উক্তি—"এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়, এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত।" 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র কাহিনি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—প্রবাদ-প্রতিম এই রবীন্দ্রোক্তিই আলোচ্য নাটকের তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটিকে রীতিসিদ্ধ নাটকরূপে গ্রহণ করে মন্তব্য করেছেন, "প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর উদ্দেশ্য তত্ত্ব প্রতিপাদন; ইহার চরিত্রগুলি সবই রূপকধর্মী, তত্ত্বসমস্যার বিভিন্ন উপাদানের প্রতিচ্ছবি। এখানে সমস্ত মায়াবন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীজীবন মমতারূপিণী বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অনুশোচনাপীড়িত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি মানবিক; উহার রূপায়ণ পদ্ধতি ঠিক নাট্যধর্মী না হইয়া অনেকটা আখ্যানধর্মী হইয়াছে।" অধ্যাপক টমসন্ এটিকে রবীন্দ্রনাথের 'first important drama' বলে অভিহিত করেছেন।

❖ **মায়ার খেলা ঃ** এই পর্যায়ের শেষ নাটক 'মায়ার খেলা'। 'মায়ার খেলা'ও গীতিনাট্য কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, " 'মায়ার খেলা' ভিন্ন জাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি প্রতিভা.....যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনা স্রোতের উপর তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই জগৎ সংসারের প্রেম-সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণে উন্মুখ ছিলেন। 'মায়ার খেলা'য় ভাবের দিক দিয়ে আর একটুখানি এগিয়ে গেছেন। এখানে দেখা যায়, শুধু ব্যক্তি-সুখেই নিমগ্ন থাকা যথেষ্ট নয়, 'অন্তহীন অপরিমেয়তা'র সন্ধানই কাম্য। নাটকটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটক 'নলিনী' অবলম্বনে রচিত—এটি একটি দুর্বল রচনা।

[দুই] রীতিসিদ্ধ নাটক

❖ **নলিনী ঃ** নাটক রচনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতিনাট্য এবং নাট্যকাব্য রচনায় হাত পাকালেও নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে তিনি 'গানের ছাঁচে ঢালা নয়' বলে যে পরিচয় দান করেছেন, তাতে কেউ কেউ এটিকেই তাঁর প্রথম রীতিসিদ্ধ বা নিয়মানুগ নাটক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর তত্ত্বপ্রাধান্য, রূপকধর্মিতা এবং গীতিপ্রাণতার কারণে একে রীতিসিদ্ধ নাটক বলে অভিহিত করা কষ্টকর। এটির অল্প পরেই রচিত 'নলিনী'কেই সর্বপ্রথম গদ্যনাটক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'নলিনী' ছয়টি দৃশ্যে গদ্যে রচিত 'একাঙ্কিকা' ধরনের নাটক। বিশেষ উদ্দেশ্যে নাটকটি রচিত হলেও দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এটি অভিনীত হতে পারেনি। এরই রূপান্তর ঘটেছিল 'মায়ার খেলা' নামক গীতিনাট্যে। 'নলিনী' নাটকেও তত্ত্ব আছে, নাট্যধর্মিতাবর্জিত একেবারে নয়। এই নাটিকাটি রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বাধিক উপেক্ষিত।

❖ **রাজা ও রানী ঃ** রবীন্দ্রনাথ গীতিপ্রাণতা এবং কাব্যপ্রবণতাকে অতিক্রম করে যখন প্রথম প্রকৃত রীতিসিদ্ধ বা নিয়মানুগ নাটক রচনা করেন তখন তিনি আটাশ বছরের পরিণতমনস্ক যুবক। একালে রচিত তাঁর প্রথম নাটক 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯)। জালন্ধররাজ বিক্রম তাঁর মহিষী সুমিত্রার মোহে ছিলেন অন্ধ, রাজকর্তব্যে অমনোযোগী। সুমিত্রা রাজার চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় গোপনে পিতৃগৃহ কাশ্মীরে পলায়ন করেন। ফলে জালন্ধর ও কাশ্মীরের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, বহু ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার চরম পরিণতি ঘটে সুমিত্রার মৃত্যুতে, অথচ তার প্রাক্কালেই বিক্রম লোভমোহমুক্ত

Scanned with CamScanner

হয়ে যথার্থ প্রেমের মধ্য দিয়ে সুমিত্রাকে ফিরে পাবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই মূল কাহিনিটির সঙ্গে সুমিত্রা-ভ্রাতা কুমারসেন ও ইলার একটি উপকাহিনিও যুক্ত হয়েছে। এই 'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণায়ত পঞ্চাঙ্ক নাটক, যেখানে মোটামুটিভাবে শেকস্‌পীয়রীয় আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটিতেই সর্বপ্রথম যাবতীয় নাট্যগুণেরও সমাহার ঘটেছে। কৃষ্ণ কৃপালনী বলেন যে, 'রাজা ও রানী' "may be considered his nearest approach to a Shakespearean model, that is plenty of action, much of its violent, contrast of characters and an inevitable subplot enlivened by intrigue." কাহিনির প্রধান চরিত্রগুলি সুপরিস্ফুট, ঐতিহাসিক পটভূমিকাটিও যথাযথ। কিন্তু এতে ঘটনার আড়ম্বর ও আতিশয্য এত বেশি যে নাটকটি দস্তুরমতো melodrama বা অতিনাটকে পরিণত হয়েছে। ইলার মূর্ছা, কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড হস্তে সুমিত্রার আগমন, পতন ও মৃত্যু প্রভৃতি অপরিহার্য ছিল না। এ ছাড়াও অতিকাব্যিক সমাপ্তি ও 'কুমারসেন-ইলা'র উপকাহিনির অতিবিস্তারও নাটকের ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং তাই পরবর্তীকালে নাটকটি সংশোধন করে 'তপতী' নামে নতুনভাবে প্রকাশ করেন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় 'রাজা ও রানী'র সমালোচনা করে নিজেই বলেছেন, " 'রাজা ও রানী' আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।" সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে তার অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল। এইটাই 'রাজা ও রানী'র মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন,

"অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। .....তখনই স্থির করেছিলাম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। (তপতী) লিখে এই বইটির সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শেষ করেছি।"

❖ **তপতী ঃ** 'তপতী' গদ্যে লেখা। এতে 'কুমারসেন-ইলা' কাহিনি বর্জিত হয়েছে এবং কবি ভাব-বিলাসিতাও অনেকখানি বর্জন করে নাটককে অনেকটা সংহত রূপদান করেছেন। কিন্তু এখানে রানীকে দিব্যবিভামণ্ডিত করে তোলায় বিক্রমের প্রচণ্ডতার প্রতিস্পর্ধী কোনো চরিত্র না থাকায় নাটকটির ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। 'রাজা ও রানী'র অতিনাটকীয়তা ও ঘটনার আড়ম্বর 'তপতী'তে বর্জিত হলেও এতে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে তাত্ত্বিকতা—যা পরবর্তী যুগের সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে 'তপতী' নতুন আকারে প্রকাশিত হলেও এটিতে আদর্শ নাট্যগুণের অভাব থেকে গেছে।

❖ **বিসর্জন ঃ** 'রাজা ও রানী' নাটকের অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় প্রথাসম্মত নাটক 'বিসর্জন' (১৮৯১)—রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং মঞ্চসফল নাটক। এটিও পূর্ণায়ত পঞ্চাঙ্ক এবং 'রাজা ও রানী'র মতোই এটিও পদ্যচ্ছন্দে রচিত।—ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য এক বালিকার কাতরতায় এবং স্বীয় অন্তরের সহজ মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেবী মন্দিরে পশুবলি নিষেধ করেন। এতে রাজমহিষী এবং মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে এর প্রতিবিধানে তৎপর হন। রাজভ্রাতাও তাদের সঙ্গে যোগদান করেন কিন্তু রাজবিরোধিতায় কেউ কিছু করে উঠতে পারেননি। তখন রঘুপতি তার প্রিয় শিষ্য জয়সিংহকে জানান যে দেবীর আদেশে রাজরক্তের প্রয়োজন, অতএব জয়সিংহ যেন গোপনে রাজাকে হত্যা করে দেবী এবং গুরুর তুষ্টিসাধন করেন। এতে অন্তরের সায় না থাকলেও জয়সিংহ গুরুর আদেশে তৎপর হন, কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজাকে হত্যা করে উঠতে পারেননি, কারণ জীব-হিংসায় তার অন্তর সাড়া দেয়নি। অবশ্য গুরুর আদেশ প্রতিপালন করলেন রাজপুতবংশীয় জয়সিংহ, তিনি আপনার বক্ষরক্ত উপঢৌকন দিয়ে সর্বসমস্যার সমাধান ঘটালেন। রঘুপতির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল, তিনিও জীব-হিংসা পরিত্যাগ করলেন। —রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' নামক উপন্যাস থেকে

গৃহীত এই কাহিনিটিই নাট্যাকারে 'বিসর্জনে' রূপায়িত হয়েছে। নাটকটি প্রথম থেকেই বেশ আঁটোসাঁটো, রচনায় শৈথিল্যের পরিচয় নেই। একটি তত্ত্ব এতেও আছে—বহুকাল আমাদের সমাজে ধর্মের নামে পশুবলিরূপ একটা হিংস্রমনোভাবাত্মক সংস্কার প্রচলিত ছিল, আলোচ্য নাটকে বৃহত্তর ও মহত্তর মানবিকতাবোধের কাছে তার পরাজয় দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই নাটকের মধ্যে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে—প্রেম আর প্রতাপ।" এই দ্বন্দ্বে অবশ্য প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। এই নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্ব—দুয়েরই এমন পরিপ্রকাশ ঘটেছে, যেমনটি রবীন্দ্রনাথের অপর কোনো নাটকেই পাওয়া যায় না। অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং মঞ্চসাফল্য সত্ত্বেও 'বিসর্জন' নাটককে সর্বাঙ্গসুন্দর বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ 'বিসর্জন' শুধু নাট্য নয়, এটি 'কাব্যনাট্য'রূপেই পরিচায়িত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় নাটকটি অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ১৯২৩ সালে আগস্ট মাসে পর পর কদিন নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ প্রথমের ২৯টি দৃশ্য কমিয়ে ১৯টি দৃশ্যে নিয়ে আসেন।

❖ **মালিনী ঃ** রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রথাবদ্ধ ও রীতিসিদ্ধ নাটক 'মালিনী'। রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্মের আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, এতে সনাতনপন্থী ক্ষেমঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে, এ কর্মে তার সহায় একান্ত ভক্ত সুপ্রিয়। তাদের দাবি—মালিনীর নির্বাসন। ভিক্ষুণীর বেশে মালিনী একদিন প্রজাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হলে প্রজারা তাঁকে মেনে নিল। ক্ষেমঙ্কর তখন সুপ্রিয়কে স্থানীয় অবস্থা সামাল দেবার দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে চলে গেল বাইরে থেকে সৈন্য এনে এখানে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। ক্ষেমঙ্করের বিদেশ বাসকালে সুপ্রিয় মালিনীর সংস্পর্শে এসে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এদিকে ক্ষেমঙ্কর বিদেশ থেকে সৈন্য নিয়ে এসেও সুপ্রিয়র নিষ্ক্রিয়তায় পরাজিত ও বন্দী হলেন। রাজা তার শেষ অভিলাষ জানতে চাইলে ক্ষেমঙ্কর তাঁর বন্ধু সুপ্রিয়র সাক্ষাৎ চায়। সুপ্রিয়কে ক্ষেমঙ্করের সামনে নিয়ে এলে ক্ষেমঙ্কর তাঁর মাথায় হাতের শিকল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন এবং জল্লাদকে আহ্বান জানান। রাজা তরবারি হস্তে সিংহাসন থেকে নেমে আসার আগেই মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে।—'মালিনী'র এই কাহিনিতে বিশেষ জটিলতা নেই এবং মোটামুটিভাবে 'বিসর্জন'-এর ছাঁচেই ঢালা। উভয় নাটকের সাজসজ্জা এবং যুক্তিকৌশলের মধ্যেও যথেষ্ট ঐক্য লক্ষ্য করা যায় এবং প্রধান চরিত্র কটিও যেন একটি অপরটির প্রতিরূপ। বিসর্জনের 'রঘুপতি' ও 'জয়সিংহ'-ই যেন 'মালিনী' নাটকে 'ক্ষেমঙ্কর' ও 'সুপ্রিয়'রূপে আবির্ভূত। ভাষা ব্যবহারেও যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'বিসর্জন' এবং 'মালিনী'র তুলনামূলক আলোচনায় ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "....মালিনীর স্বল্পভাষণের পরিমিতি ও সংযম, আখ্যানবস্তুর সংগতি ও সংহতি 'বিসর্জনে' আমরা আশাই করিতে পারি না। দুটি নাটকই ট্র্যাজেডি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'মালিনী'র ট্র্যাজেডি এত ঘনীভূত, এত প্রবল এবং এত স্বল্পকাল বিস্তৃত যে, বিসর্জনের ট্র্যাজেডি সেই তুলনায় অনেকটা তরল ও নিষ্প্রভ।"—একটি বৌদ্ধ 'অবদান' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনিটি গ্রহণ করেছিলেন, তবে এর 'ক্ষেমঙ্কর-সুপ্রিয়' কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

❖ **প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ ঃ** রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে রচিত 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস অবলম্বন করে রীতিসিদ্ধ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন। প্রায় কুড়ি বছর পর আবার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটককে কেবল সাজিয়ে তত্ত্বনাটকরূপে 'পরিত্রাণ' রচনা করেন। তবে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অনেক পরিবর্তন সাধন করে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি রচনা করায় প্রকৃতপক্ষে এটিকে আর উপন্যাসের নাট্যরূপ বলা যায় না। এটি একটি নতুন গ্রন্থরূপেই বিবেচিত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কাহিনি উপস্থাপনে তথা ঘটনা সংস্থানে এবং সংলাপ-রীতিতে যথেষ্ট নাটকীয়তার সৃষ্টি করা হয়েছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে বিভার জীবনের ট্র্যাজেডি অনেক ঘনীভূত হয়েছে, ফলে এই চরিত্রটির মাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কলাকৌশলের দিক থেকেও নাটকের উপসংহার অনেক উপভোগ্য হয়েছে, যদিও তা অনেকাংশে কাব্যধর্মী হওয়াতে

Scanned with CamScanner

নাটকীয়তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকে একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যেটি উপন্যাসে ছিল না, এটি 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'। এই টাইপ চরিত্রটি স্বনামে অথবা ভিন্ন নামে রবীন্দ্রনাথের বহু সাঙ্কেতিক ও তত্ত্বনাটকে উপস্থিত। এই জাতীয় চরিত্রের সার্থকতা বিচারে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, এই চরিত্রটি "প্রত্যেকটি নাটকের সদা উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রসারিত গবাক্ষ; এই গবাক্ষ দিয়াই সত্য এবং ন্যায়ধর্মের ভারমুক্ত স্বচ্ছ সহজ সুনির্মল আলোকের দীপ্তি ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে।" বস্তুত এই ধনঞ্জয় বৈরাগী বা তৎস্থানীয় চরিত্রের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নিজের কথাটি বলার সুযোগ নিয়েছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পরিবর্তিত রূপ 'পরিত্রাণ'-এও ধনঞ্জয় চরিত্রটি বর্তমান। 'পরিত্রাণ' নাটকে কিছু চরিত্র এবং ঘটনা-সংস্থানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রবল বিরোধী শক্তির প্রতিস্পর্ধীরূপে অসহযোগিতা এবং আত্মত্যাগের মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠাকেই এই নাটকের তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হয়। নাটকের মধ্যে আচারসর্বস্ব ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

❖ **মুকুট ঃ** 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ 'মুকুট' মূলত বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজসিংহাসনের অধিকার নিয়ে রাজকুমারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পটভূমিকায় মহান আত্মত্যাগের কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এটি স্ত্রী ভূমিকা-বর্জিত এবং ছোটোদের অভিনয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই একাঙ্ক নাটকে কোনো গান না থাকলেও নাটকটি খুব স্বচ্ছন্দ গতিতেই পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

❖ **গৃহপ্রবেশ ঃ** রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের রাত্রি' নামক গল্পটিকে 'গৃহপ্রবেশ' নামক নাটকে রূপায়িত করেন। গল্প হিসেবে 'শেষের রাত্রি' নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ; কিন্তু নীতিধর্মী এই গল্পে নাটকীয় উপাদান এত কম যে 'গৃহপ্রবেশ' কখনো সার্থক নাট্যকৃতিরূপে পরিগণিত হয় না। পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টিতে যে বস্তুনিষ্ঠতার প্রয়োজন, আলোচ্য নাটকে তার অভাব নাটকটিকে দৃঢ়মূল হয়ে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ দেয়নি। নাটকের চরিত্রগুলি খুব স্বাভাবিক নয়, একমাত্র 'মাসি' চরিত্রের কল্পনাই সত্য এবং সার্থক বলে মনে হয়। "পুত্রহীনা মাসি চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও জটিলতাই যাহা কিছু নাটকীয় গুণের মূলে এবং এই চরিত্রই 'গৃহপ্রবেশ'কে দৃশ্যকাব্যের মেরুদণ্ড দান করিয়াছে।"

❖ **শোধবোধ ঃ** পূর্বোক্ত নাটকটির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্মফল' নামক ছোটোগল্পকে 'শোধবোধ' (১৩৩৩) নামক নাটকে রূপায়িত করেন। এক উচ্চ মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় নাটকের কাহিনি কল্পিত এবং সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-জটিলতার পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে নাটকটি মিলনান্তক পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। "দুঃখ ও ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়াই যে প্রেম সার্থকতর পরিণতিতে পৌঁছায়, লেখকের এই মানসাদর্শ এই লঘু মিলনান্তক নাটকটিতেও উপস্থিত।" (ড. নীহাররঞ্জন রায়)। নাটকের শেষদিকে যথেষ্ট অতিনাটকীয়তার সন্নিবেশ ঘটলেও 'শোধবোধ' নাটকটি নাটকীয়তাগুণে 'গৃহপ্রবেশ' অপেক্ষা সার্থক।

❖ **বাঁশরী ঃ** রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ ধরনের নাটক 'বাঁশরী' (১৩৪০)। সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে এই নাটকের একস্থানে নাট্যকার মন্তব্য করে লিখেছেন, "সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোঙরামিকে নয়" (২।১)। প্রকৃতির দিক থেকে এটি 'গৃহপ্রবেশ' বা 'শোধবোধ' নাটকের মতোই প্রথাবদ্ধ ও রীতিসিদ্ধ নাটক, কিন্তু ভাষা ব্যবহার বা বাচন-ভঙ্গির বিচারে এটি রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসের সমগোত্র। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "এমন কি এই হিসাবে 'শেষের কবিতা'র ব্যঙ্গ ও epigram-সমৃদ্ধ বঙ্কিম ও চতুর বাক্‌ভঙ্গি ও ভাষার সঙ্গে এই গ্রন্থের একটা দূর আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, যদিও পরবর্তী উপন্যাসগুলির মতনই 'বাঁশরী'র ভাষার বা বাক্‌ভঙ্গিতে 'শেষের কবিতা'র শাণিত দীপ্তি, আলো ঝলমল

Scanned with CamScanner

চমক অনেক দুর্বল ও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।" নাটকটির বিষয়বস্তু এবং ভাষা অবলম্বনে একটি উৎকৃষ্ট ছোটো উপন্যাস বা বড়ো গল্প রচনা করা যেত, কারণ যথার্থ নাটকীয় উপাদানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে এতে। ঘটনাবস্তু, চরিত্র এবং সংলাপে এতে বাস্তবতার অনুপস্থিতি একে একটি দুর্বল নাটকে পরিণত করেছে।

[তিন] নাট্যকাব্য

■ **নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য ঃ** রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে নামকরণে কিছুটা বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'দৃশ্যকাব্য'কে সাধারণভাবে 'রূপক' নামে অভিহিত করা হত এবং দশবিধ রূপকের একটি ছিল 'নাটক'। প্রতিটি রূপকের সুনির্দিষ্ট লক্ষণও চিহ্নিত ছিল, অতএব নামকরণে কোনো অসুবিধা ছিল না। আমরা বাংলায় প্রথমেই 'দৃশ্যকাব্য' মাত্রকেই 'নাটক' নামে চিহ্নিত করেছি। দৃশ্যকাব্য বা নাটকের বিভিন্ন শ্রেণিকে আর প্রাচীন নামে অভিহিত করি না, কারণ আধুনিক যুগের বাংলা নাটক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের আদর্শে সৃষ্ট হচ্ছে না। একালের নাটকের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে, অতএব তদনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির নাটককে চিহ্নিত করার জন্য এদের যথাযথ নামকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই গতানুগতিকতার বাইরে নাটকে প্রথম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন এবং বিভিন্ন নাটককে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেন, যথা—'গীতিনাট্য', 'নাট্যকাব্য', 'গদ্যনাট্য', 'কৌতুকনাট্য', 'গদ্যনাটক', 'নাটক', 'প্রহসন', 'নৃত্যনাট্য' প্রভৃতি। কিন্তু সমালোচকগণ নাটকের শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে কিছুটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। রবীন্দ্র-নাটকের ক্ষেত্রে তাঁরা এক জাতীয় নাটককে 'কাব্যনাট্য' বলে নির্দেশ করেন। প্রখ্যাত সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ' এবং 'কাহিনি'র ('গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রভৃতি) সংলাপাত্মক কবিতা (যাদের Reading drama বলা চলে) কটি সম্বন্ধে বলেন, "এগুলিতে মোটামুটি কাব্যগুণের প্রাধান্য বলিয়া ও নাট্যরস কাব্যবেষ্টনী সংহত বলিয়া ইহাদিগকে নাট্যকাব্য এই আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। যেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করিয়া উহার সমশক্তিসম্পন্ন সহযোগিতা অথবা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে কাব্যনাট্য অভিধাই বিধেয়।"—এখানে 'কাব্যনাট্য' বলতে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি নাটকের কথা বলা হয়েছে।

❖ **চিত্রাঙ্গদা ঃ** 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। কাব্যটির মূল কাহিনি গৃহীত হয়েছে মহাভারতোক্ত মণিপুরদুহিতা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ থেকে, যদিও এর উপস্থাপনা, ঘটনা সংস্থাপনা এবং অনুপুঙ্খ বিবরণ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ জীবন-সায়াহ্নে তাঁর প্রথম জীবনের একটি তাত্ত্বিক ভাবনাকে 'চিত্রাঙ্গদা' রচনার মূল বলে উল্লেখ করেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফেরার পথে সম্ভবত কোনো সুন্দরী যুবতী দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—প্রেমিককে ভোলানোর জন্য তাঁর সুরূপ দায়ী অথবা তাঁর অন্তরস্থিত যথার্থ চারিত্রশক্তি দায়ী? এই সমস্যা এবং তাঁর রাবীন্দ্রিক সমাধান নিয়েই 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য। পুরুষবেশধারী পৌরুষমণ্ডিত পুরুষকঠিন অর্জুনের হৃদয়-হরণে চিত্রাঙ্গদা অক্ষম হয়ে মদনের বলে লাবণ্যময়ী নারীতে পরিণত হন এবং অর্জুনের প্রেমে ধন্য হন। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় উভয়ের মনে; বাইরের রূপ দিয়ে অর্জুনকে জয় করেছে বলে চিত্রাঙ্গদা যেমন লজ্জিত হল, তেমনি অর্জুনের মনেও দৈহিক লালসায় অতৃপ্তি এসে গেল। বছরান্তে মদনের বরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে চিত্রাঙ্গদা আবার পূর্বরূপ ফিরে পায়। স্বরূপ-প্রত্যাবৃত্ত চিত্রাঙ্গদার আন্তর চারিত্রশক্তি এবং সৌন্দর্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন এবার চিত্রাঙ্গদার প্রেমে ধন্য হলেন। বহিঃসৌন্দর্য অপেক্ষা অন্তঃসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব রবীন্দ্রনাথের বহু কাব্যে বহুবার বর্ণিত হয়েছে, কাজেই এটিকে তত্ত্ব বলে অভিহিত করা সঙ্গত নয়, এটি রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্য। রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু গ্রন্থনা এবং রচনার কলাকৌশল,

Scanned with CamScanner

সব মিলিয়ে সমালোচকবৃন্দ এর প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ। ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই অপূর্ব কাব্যনাট্যের ঘটনাবস্তু, চরিত্র, বিচিত্র বিষয়, কাব্যসৌন্দর্য ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কলাকৃতিকে সুপ্রকাশিত করেছে।" ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতা, বর্ণনার গৌরব, কামনা-বাসনার মৃদু ও তীব্র সৌরভ, চিত্রমহিমা এবং ভাবব্যঞ্জনা 'চিত্রাঙ্গদা'কে অপরূপ কাব্যমূল্য দান করিয়াছে। সত্যই 'চিত্রাঙ্গদা'র কাব্যমহিমার দীপ্তিতে নরনারীর প্রেমরহস্য আলোকিত।"

❖ **বিদায় অভিশাপ ঃ** একটিমাত্র দৃশ্যে কচ ও দেবযানীর সংলাপে ধৃত 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্যটির একটি নাটকীয় সমাপ্তি থাকলেও অন্যত্র এর মধ্যে গতি বড়ো কম, নাটকীয় সংঘাতও প্রায় নেই, যা আছে, তা অতিশয় মৃদু। একটি বিশেষ মন্ত্রলাভের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে সমাগত কচ বিদ্যাশিক্ষান্তে গুরুকন্যা দেবযানীর নিকট বিদায় ভিক্ষা চাইছেন—এই পটভূমিকায় কাহিনিটি উক্তি-প্রত্যুক্তিক্রমে বর্ণিত। গুরুগৃহবাসকালে কচ গুরুকন্যার হৃদয়টি যে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিলেন, তা তিনি হয়তো জানতেও পারেননি; তাই তাঁর বিদায়কালে নানাবিধ কথার ছলে দেবযানী তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কচ কিছুতেই কর্তব্যভ্রষ্ট হবেন না, অতএব দেবযানীর যাবতীয় যুক্তিও অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয়। ক্রুদ্ধা দেবযানী অভিশাপ দিলেন, কচ প্রয়োজনকালে মন্ত্র ভুলে যাবেন; প্রত্যুত্তরে কচ দেবযানীকে শুধু সুখী হবার আশীর্বাদই জানিয়ে গেলেন। —নাট্যকাব্যটি সম্বন্ধে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, "একদিকে চিরন্তন মানবীয় জীবনসমস্যার কারুণ্যমেদুর-সার্থক রূপায়ণ, আর একদিকে প্রেম-সৌন্দর্যে নিমগ্ন-মানস রোমান্টিক কবিচেতনার আত্মসম্ভোগের আনন্দ—দুই মিলে রচনাটিতে অপূর্ব কবিতাগুণের আরোপ করেছে।....নাটকীয় উন্মোচন-রীতির আধারে রোমান্সরহস্যাকীর্ণ কবিতারসের এই অভিব্যক্তি মিশ্রস্বাদী, নাট্যদেহ প্রায় অসম্পূর্ণ গঠিত; গীতিকবিতার সৌন্দর্যঝঙ্কার উন্মদ; সবকিছু মিলে 'বিদায় অভিশাপ' 'নাট্য কাব্য'ই বুঝি—একটি নিটোল নাট্যকবিতা।"

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ'-এর রীতিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরো পাঁচটি নাট্যকাব্য তাঁর 'কাহিনি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন' এবং 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মহাভারত থেকে গৃহীত, 'নরকবাস' পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত, 'সতী'র কাহিনি গৃহীত হয়েছে মারাঠি গাথা থেকে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রবীন্দ্রনাথের স্বকল্পিত একটি Fantasy।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া বাকি চারটি 'নাট্যকাব্য' নামে অভিহিত হবারই যোগ্য, কারণ এগুলি মূলত কাব্যই, তবে নাট্যধর্মও কিছু কিছু বর্তমান রয়েছে। তবু পূর্ববর্তী 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'বিদায়-অভিশাপে'র মতোই এদের গীতিমূর্ছনা এবং কাব্যসুষমাই মনের ওপর সর্বাধিক রেখাপাত করে থাকে। রচনারীতি ছাড়াও এই নাট্যকাব্য কটির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যও বর্তমান।

❖ **গান্ধারীর আবেদন ঃ** 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যে দুর্যোধনকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানিয়াছেন দুর্যোধন-জননী ও ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী। পুত্রের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে এবং সত্যধর্ম, ন্যায়ধর্ম এবং মানবধর্মের স্বপক্ষে জননীর অভিযোগ—বিষয়টি নিঃসন্দেহে অতিশয় নাটকীয়। এই নাটকীয়তা কেবল বাইরের জগতেই নয়, গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর জগতেও তা সংক্রামিত হয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন, " 'গান্ধারীর আবেদনে' গান্ধারীর চরিত্রে একদিকে পুত্রস্নেহ ও স্বামীধর্ম এবং অন্যদিকে সত্য নিত্যধর্ম ঃ ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রেও পুত্রস্নেহ ও নিত্য মানবধর্মের বিরোধ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাঁহার নাটকীয় সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ নাই, তাঁহার কারণ, তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ এবং আত্মদৌর্বল্যে পীড়িত; কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গান্ধারীর ধর্মদীপ্তির সম্মুখীন হন, সেই মুহূর্তেই এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং গান্ধারীর দীপ্তির সম্মুখে তাঁহার দুর্বলতা ধিক্কৃত ও লজ্জিত হয়।" কাব্যে বিশেষভাবে গান্ধারীর চরিত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকীয় মহিমা লাভ করেছে।

Scanned with CamScanner

❖ **সতী** ঃ 'সতী' নাট্যকাব্যের কাহিনিটি একটি মারাঠি গাথা থেকে গৃহীত হয়েছে। নাটকটিতে একদিকে স্বভাবজাত পিতৃস্নেহ ও অপরদিকে সংস্কার ও সমাজধর্মের দ্বন্দ্ব যখন পিতৃহৃদয়কে আলোড়িত করে তুলেছে, তখনই আর একটি দ্বন্দ্ব পাশাপাশি দেখা গেল মাতৃহৃদয়ে, যেখানে সংস্কারের মোহে মাতা স্বভাবজ মাতৃস্নেহকে ভুলে গেলেন। আবার কন্যা চিরাচরিত সঙ্কীর্ণ সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে স্বাভাবিক মানবিক ধর্মের বশে তার প্রেমিককে ভিন্ন ধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর মর্যাদা দান করলো—'সতী' নামের সার্থকতা এখানেই।

❖ **নরকবাস** ঃ 'নরকবাস' নাট্যকাব্যের বিষয়টি পুরাণ থেকে গৃহীত। ঋত্বিকের প্ররোচনায় রাজা সোম পুত্রকে যজ্ঞাগ্নিতে বলি দেন; কিন্তু তাঁর জন্য তিনি অনুশোচনা ভোগ করেন বলে তাঁর স্বর্গবাস হয়, কিন্তু ঋত্বিকের হয় নরকবাস। রাজা সত্যধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য সম-অপরাধে অপরাধী ঋত্বিকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নরকবাস বরণ করে নেন।

❖ **কর্ণ-কুন্তী সংবাদ** ঃ 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' 'কাহিনি' কাব্যের সব নাট্যকাব্যের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও নাট্যগুণসম্পন্ন। কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র; কিন্তু সেই সংবাদ তাঁর জানা ছিল না। তিনি নিজেকে 'অধিরথসুতপুত্র রাধাগর্ভজাত' বলেই জানতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ ছিলেন কৌরবদের পক্ষে সেই যুদ্ধকালে কুন্তী কর্ণের কাছে এসে তাঁর পরিচয় জানিয়ে দিয়ে তাঁকে দেখালেন যে যুদ্ধজয়ী পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে তিনিই হবেন রাজা। কর্ণ বিপদের মুখে তাঁর আশ্রয়দাতা দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃত হলেন এবং কুন্তীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "কর্ণের মহনীয় বীরধর্মের দীপ্তি কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের এবং কুরুক্ষেত্র রণধর্মের পটভূমিকায় সমস্ত নাট্যকাব্যটিকে এমন একটি করুণ অথচ সুদৃঢ় মর্যাদা দান করিয়াছে যাহার ফলে নাটকীয় দ্বন্দ্ব যেন আরো সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়।"—এই নাট্যকাব্যটিতে কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে নাটকীয়তা সম্পূর্ণ সঙ্গতি লাভ করেছে এবং সাহিত্যরস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

❖ **লক্ষ্মীর পরীক্ষা** ঃ 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাট্যকাব্যটি একটু ভিন্ন ধরনের। অপর নাট্যকাব্যগুলি যেমন প্রধানত Reading drama বা পাঠযোগ্য নাটক অভিনয়-যোগ্যতা অনেক কম, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'-র ক্ষেত্রে তেমন বলা যায় না। এর অভিনয়-যোগ্যতা সন্দেহাতীত এবং বহুবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে। ফলে একে 'নাট্যকাব্য' না বলে 'কাব্যনাট্য' বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকটি ঘটনার আবর্তে যথেষ্টই নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। নাটকটির সব কটি চরিত্রই স্ত্রী। নাটকের অপর বৈশিষ্ট্য—এটি একটি Fantasy, একটি স্বপ্নের কাহিনিই এর মূল ঘটনা।

[চার] কৌতুক নাট্য

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রেই অপরিমেয় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, অতএব তিনি যে একজন রসিক পুরুষ ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে রচিত বহু রচনাতেও এই রসবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে সাধারণত গীতিকবিদের ক্ষেত্রে আবেগের প্রবলতার দরুণ রঙ্গ-রসের খেলা তেমন জমে না বলেই দেখা যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য জীবনের শুরুতেই অনেক ছোটো ছোটো হাস্যকৌতুক রচনা করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ১২৯২ সনের বৈশাখ মাস থেকেই তিনি 'ভারতী' এবং বিশেষভাবে 'বালক' পত্রিকায় 'হাস্যকৌতুক' নামে অনেকগুলি ব্যঙ্গনাট্য রচনা করেন।

❖ **হাস্যকৌতুক** ঃ 'হাস্যকৌতুক' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপের শারাড্ (Charade) নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।

Scanned with CamScanner

এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।" 'হাস্যকৌতুকে' অনেকগুলি অতিশয় ক্ষুদ্রকায় নাটক রয়েছে—'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'অভ্যর্থনা', 'রোগের চিকিৎসা', 'চিন্তাশীল', 'ভাব ও অভাব', 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'আর্য ও অনার্য', 'একান্নবর্তী', 'সূক্ষ্মবিচার', 'আশ্রমপীড়া', 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার', 'রসিক' ও 'গুরুবাক্য'। ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের দুর্বলতা বা অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করেই এই ব্যঙ্গনাটকগুলি রচিত। কোথাও অহংবোধ, কোথাও শিক্ষাব্যবস্থা, কোথাও বা দেশসেবার নামে ভণ্ডামিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই লেখক তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "এই হাস্যও আবার একেবারে নির্মল অট্টহাস্য, সূক্ষ্ম রসিকতার চাপা হাসি নয়, কিংবা তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ ঝলক নয়—ইহাদের আগাগোড়াই হাস্যকৌতুক বিস্তৃত, যেন একেবারে শরৎকালের সকালবেলার সোনালী রৌদ্র।"

❖ **ব্যঙ্গকৌতুক ঃ** রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুকে' পাঁচটি রচনা আছে—'বিনি পয়সার ভোজ', 'নূতন অবতার', 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি', 'স্বর্গীয় প্রহসন' এবং 'বশীকরণ'। সবকটি রচনাকে যথার্থ নাটক বলে মেনে নেবার পক্ষে কিছু অসুবিধে রয়েছে—রচনা বৈচিত্র্যই অবশ্য এর কারণ। 'বিনি পয়সার ভোজ'কে একটি অনবদ্য রস-রচনারূপে গ্রহণ করা চলে, এতে নাটকীয়তার কোনো সুযোগ নেই, কারণ নাটকে একজন মাত্র পাত্রই মঞ্চে উপস্থিত। অবশ্য নেপথ্যে আরো অনেক কটি চরিত্রেরই কল্পনা করা হয়েছে। এটিকে 'নাটকীয় একোক্তি' বা dramatic monologue নামে অভিহিত করা যায়। দ্বিতীয় রচনা 'নূতন অবতার'-এ যদিও তিনটি অঙ্কের নির্দেশ রয়েছে, তবু এখানেও প্রতি অঙ্কে একজন করে অভিনেতা। 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'ও বস্তুত নাটকীয় একোক্তি। এ দুটির কোনোটিতেই নাটকীয়তা নেই। 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এ একটিমাত্র দৃশ্য হলেও এতে বিভিন্ন দেবতারা কুশীলবরূপে বর্তমান থাকায় এটিকে নাটকরূপে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু এর শ্লথবন্ধ রচনা, স্থূলতাধর্মী ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের অতিপ্রত্যক্ষতা নাটকের নাট্যগুণকে এবং ব্যঙ্গের সরসতাকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করেছে। গ্রন্থের শেষ রচনা 'বশীকরণ' একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গনাট্য। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "ঘটনা- বিন্যাসে, নাটকীয় গতি ও সংস্থানে সর্বোপরি বিষয়বস্তুর সংহত সমগ্রতায় 'বশীকরণে'র সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য; অথচ সমস্ত নাটকটি দাঁড়াইয়া আছে কৌতুকাবহ ভ্রান্তিবিলাসের উপর। একটির পর একটি ভুলের আশ্রয়ে অফুরন্ত কৌতুকের সৃষ্টি—বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিবেশে একটি নিখুঁত comedy of errors, এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মত, বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের সংঘর্ষ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কৌতুকাবহ দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি করে তাহারই ওপর এই স্বল্পকায় নাটকটি নির্ভর।"

❖ **গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা ঃ** রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণায়ত প্রহসন 'গোড়ায় গলদ'। কিন্তু রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে মধুসূদন, দীনবন্ধু বা গিরিশচন্দ্র যে জাতীয় প্রহসন রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' চরিত্রগতভাবে তা থেকে স্বতন্ত্র, এটি খাঁটি 'কমেডি নাটক'। এটি পঞ্চাঙ্ক নাটক, তবে ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র সৃষ্টি এবং সংলাপ কৌতুকরসে পরিপূর্ণ। একটি পারিবারিক পরিবেশে ভ্রান্তিবিলাসের ফলে যে অমৃতমধুর রসের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 'গোড়ায় গলদ' নাটকে তারই একটি চিত্র রচিত হয়েছে। ব্যঙ্গনাটক হলেও এতে বিদ্রূপ বা শ্লেষ নেই, এতে রয়েছে শুধুই ব্যঙ্গ কশাঘাতবিহীন নিরবচ্ছিন্ন কৌতুক। নাটকটিতে অভিনয়গত কিছু ত্রুটি বর্তমান থাকায় সুদীর্ঘকাল পর রবীন্দ্রনাথ এটিকে সংশোধিত আকারে 'শেষরক্ষা' নামে রূপায়িত করেন। মূল নাটকে গোড়ার ভুলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, 'শেষরক্ষা'য় শেষ পরিণতির ওপর লেখক সেই গুরুত্বকে সরিয়ে এনেছেন। 'শেষরক্ষা'য় সংলাপকে আরো সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে এবং হাস্যরসকে আরো সূক্ষ্ম এবং মার্জিত করে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে নির্দোষ করে তুলেছেন। ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 'শেষরক্ষা' কমেডি হিসেবে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সামান্য ভ্রান্তি ও খেয়াল থেকে তরুণ-তরুণীর নাস্তানাবুদ হওয়া,

Scanned with CamScanner

তরী বানচাল হওয়ার মুখে এসে গলদের অবসান এবং হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে 'মধুরেণ' সমাপ্তি এই নাটিকাটিকে জনসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় করেছে। এর সামান্য জটিলতাপূর্ণ ঘটনাগ্রন্থন এবং বিশেষ বিশেষ 'টাইপ' চরিত্রের হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণ রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কলাকৌশলকে নতুন গৌরব দিয়েছে।"

❖ **বৈকুণ্ঠের খাতা ঃ** 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রবীন্দ্রনাথের একটি স্বল্পকায় কৌতুক নাটিকা—তিনটি মাত্র দৃশ্যে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে কয়েকটি চরিত্রকে রূপে রেখায় রবীন্দ্রনাথ একেবারে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। এই নাটিকায় শ্লেষ কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কোনো পরিচয় নেই, এর আগাগোড়া প্রবাহিত হয়েছে করুণ-মধুর কৌতুকরসের প্রবাহ। এই কারণে অনেকেই এটিকে শুধুমাত্র 'প্রহসন' বলতে দ্বিধা বোধ করেন, এ কারণে কেউ কেউ একে 'লঘুনাটিকা' নামে অভিহিত করে থাকেন। এতে কৌতুকরসের পাশাপাশি স্নিগ্ধমধুর করুণ রসের ধারা যেমন বইছে, তেমনি স্বার্থপর কুটিল চরিত্রকে নিয়ে কৌতুক করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মভোলা অতিশয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেও কৌতুকের পাত্র করে তোলা হয়েছে, যদিও সেই চরিত্র-চিত্রণে মাধুর্য, সহৃদয়তা এবং সম্ভ্রমবোধের কোনো অভাব ঘটেনি।

❖ **চিরকুমার সভা ঃ** 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রিকায় 'চিরকুমার সভা' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন, পরে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে এটি গ্রন্থভুক্ত হয়। সুদীর্ঘকাল পর রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দানের পর আবার একে 'চিরকুমার সভা' নামে অভিহিত করেন। সাধারণভাবে 'সন্ন্যাস' বা 'কৌমার্য' ধর্মের উপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না বলে তিনি 'চিরকুমার সভা'র কুমারদের ব্রতভাঙ্গাকেই এই ব্যঙ্গনাটক বা প্রহসনটির উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। নাটকটি দীর্ঘকাল প্রশংসিত হয়ে আসছে। সুধী সমালোচকের কথায়, " 'চিরকুমার সভা' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন বা উহার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন কি হাস্য পরিহাসে উজ্জ্বল, কি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ঝলকিত এই নাটকখানি। ঘটনাবস্তুর সংস্থান, কথাবার্তার চালচলনের ভঙ্গি, চিত্ত ও চরিত্র-প্রকৃতি সমস্তই একটি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল সকালবেলার রৌদ্রালোকে যেন ঝল্‌মল্ করিতেছে। এত ব্যঙ্গ এত বিদ্রূপ অথচ কোনো রূঢ়তা, কোনো নিষ্ঠুরতা তাহাকে স্পর্শও করে নাই, সুকোমল রুচিকেও কোথাও তাহা আঘাত করে নাই। প্রত্যেকটি চরিত্রই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, এমন কি ছোটোখাটো চরিত্রগুলিও; আর, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে সহৃদয় সহানুভূতির স্পর্শও সুস্পষ্ট।"

[পাঁচ] রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক

■ **তত্ত্ব নাটক ঃ** রীতিসিদ্ধ ও প্রথাবদ্ধ কয়েকখানি নাটক রচনার পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল নাটক রচনা থেকে বিরত ছিলেন। প্রায় বারো বছর পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে 'শারদোৎসব' রচনার মধ্য দিয়ে আবার যে পালা শুরু হল, তাতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে চলেছেন, যার কোনো পূর্ব ঐতিহ্য অন্তত এদেশে মেলে না। এই ধারার অন্তর্গত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে—'রাজা' ('অরূপরতন'), 'অচলায়তন' ('গুরু'), 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এবং 'শারদোৎসবে'র পরিবর্তিত রূপ 'ঋণশোধ'। এই নাটকগুলি পূর্ববর্তী গীতিনাট্য, রীতিসিদ্ধ নাট্য এবং কৌতুকনাট্য থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কাহিনি বিরল এই নাটকগুলির বাইরের আবরণ মোচন করতে পারলেই তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবসত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিকে সাধারণত 'রূপক-সাঙ্কেতিক' বা 'তত্ত্বনাটক' নামে অভিহিত করা হয়।

'রূপক' ও 'সাঙ্কেতিক' শব্দ দুটিকে আমরা প্রায় যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করি; অথচ এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়ে গেছে। গ্যয়টে এবং ইয়েট্‌স্ এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তার সার গ্রহণ করে অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, "অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু

Scanned with CamScanner

রূপান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রূপক রচনায়। প্রথমটিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নৈতিক উদ্দেশ্যের সৌন্দর্যময় ছদ্মবেশ। অধ্যাত্মজগতের স্বরূপ তো বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে—'যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। কিন্তু মানুষের নৈতিক জগতের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা সহজ। সেজন্য সাঙ্কেতিক রীতিতে অপ্রকাশ্য শেষপর্যন্ত অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায় কিন্তু রূপক রীতিতে অপ্রকাশিত ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র।" আর্থার সাইমন্‌স্ তাঁর *'The Symbolist Movement in Literature'* গ্রন্থে সাঙ্কেতিকতা বিষয়ে সে সকল মূল্যবান কথা বলে গেছেন, তার মধ্যে আমরা পাই যে—সে সাহিত্যে আমরা প্রত্যক্ষ জগতের পরিচয় পাই তাই শুধু সত্য নয় এবং অদৃশ্য জগৎ মাত্রই স্বপ্ন বা মিথ্যা নয়। এই নিত্যক্ষয়িষ্ণু বস্তুজগতের কোনো কিছুরই তো স্থায়িত্ব নেই, কিন্তু বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে যে অজেয় অমর শাশ্বত আত্মার প্রবাহ বয়ে চলছে, সাঙ্কেতিকতাবাদিগণ এই অধ্যাত্মজগতের মধ্যেই সেই চির সত্যের সন্ধান লাভ করে থাকেন। অধ্যাত্মজগতের বাইরে কোনো গূঢ় জীবনসত্যকে প্রকাশ করার জন্যও সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার করা হতে পারে। জীবনের কোনো তুচ্ছ বিষয়কে কল্পনাদীপ্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত না করে কোনো মানস সত্য বা উপলব্ধ সত্যকে একটি বিশেষ অর্থসমন্বিত মহিমায় উন্নীত করাই সাঙ্কেতিক নাটকের কাজ। সাঙ্কেতিক নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতীকতা জীবনের বিশেষ অর্থদ্যোতনায় সর্বজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলির যথার্থ পরিচয় বা সংজ্ঞার ব্যাপারে মতান্তরের অবকাশ রয়েছে। যেমন, ড. নীহাররঞ্জন রায় রূপক ও সাঙ্কেতিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিধান করেননি। ড. সুবোধ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে 'সাঙ্কেতিক' নামে অভিহিত করে বলেন, "রবীন্দ্রনাথের নাটক সাঙ্কেতিক। তাঁহার মধ্যে রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু অরূপ, অসীমের সন্ধানই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।" তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' এবং 'রাজা' নাটক দুটি শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটকরূপে গণ্য হতে পারে, অথচ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এ দুটিকে রূপক নাটক বলে অভিহিত করেছেন। আবার অধ্যাপক সেনগুপ্তের মতে 'মুক্তধারা, রক্তকরবী এবং অচলায়তন' সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটকের মিশ্রিত রূপ, আর অধ্যাপক বিশীর মতে এগুলি অবিমিশ্র সাঙ্কেতিক নাটক। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো নাটকের রূপকার্থ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হলেও সব নাটকেই অসীম রহস্যের দ্যোতনা থাকায় তাঁর সব নাটকই যে সাঙ্কেতিকধর্মী—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় সব নাটককে 'তত্ত্বনাট্য' বলে অভিহিত করে মতানৈক্যের দায় এড়িয়ে যাওয়াতে অনেকেই এই নামটিই সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকেন। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য এভাবে নির্দেশ করেছেন,—"রূপকের ধর্ম রূপময় করা, স্পষ্টতর করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপারকে বুদ্ধি ও প্রতীতির গোচরীভূত করা। সাঙ্কেতিক নাটকের ধর্ম স্বতন্ত্র। সাঙ্কেতিক সাহিত্য মূলত অপরূপ রহস্যেই ভরপুর। রহস্য সমাধান সঙ্কেতের কাজ নয়। জগৎ ও জীবনের চারিদিকে যে রহস্যময় বাতাবরণ রয়েছে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যার অস্বচ্ছতা ভেদ করতে পারে না, যার স্বরূপ বুঝতে গিয়ে দুর্জ্ঞেয়তার পাষাণ-প্রাচীরে বাধা পায়— সঙ্কেতের সাহায্যে তাঁর আভাস-ইঙ্গিত লাভ করার চেষ্টা সাঙ্কেতিক সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য।"

য়ুরোপে মেটারলিঙ্ক, হাউপ্টম্যান, ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি নাট্যকারগণই প্রথম সাঙ্কেতিক নাটক রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক এঁদের পরে রচিত হওয়াতে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এইসব নাট্যকারের সাঙ্কেতিক নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। সাঙ্কেতিকতা রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবন প্রত্যয়ে আস্তিক্যবাদী এবং আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক য়ুরোপীয় নাটকের বিষণ্ণতা বা অবক্ষয় লক্ষণ থেকে মুক্ত। য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক নাটকে রহস্য সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

Scanned with CamScanner

নাটকে অন্তিমে সব রহস্যেরই সমাধান ঘটে গেছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথেই সাঙ্কেতিক নাটক য়ুরোপীয় নাটক দ্বারা প্রভাবিত, এ কথা বলা সম্ভবত সঙ্গত নয়। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "....অধ্যাত্মসত্যকে নাটকীয় রূপদানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে নিজ মৌলিক তত্ত্বানুভূতির ওপর নির্ভরশীল ও তাঁহার অবলম্বিত প্রণালীও নিজ উপলব্ধি নির্ভররূপে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতীন্দ্রিয় রহস্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বচেতনা ও শিল্পায়ন কৌশল তাহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন পথের নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছে।"

❑ **বৈশিষ্ট্য ঃ** 'রূপক-সাঙ্কেতিক' নাটক যে শুধু প্রকৃতিগত দিক থেকেই স্বতন্ত্র, তা নয়, অপর সকল নাটক থেকে এ জাতীয় নাটকের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে বহিরঙ্গের বিচারেও। সাধারণ নাটকে ক্রিয়া (action) অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, কিন্তু তত্ত্বনাট্যগুলি ক্রিয়াবিরল। দ্বন্দ্বের মধ্যেই নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত; সাঙ্কেতিক নাটকে বহির্দ্বন্দ্বের অবকাশ কম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে প্রাণধর্মের সঙ্গে জড়ধর্মের দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করেছেন। নিষ্প্রাণ জড়শক্তির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ও অবাধ মুক্তির প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকগুলির মূলকথা। প্রকৃতি-প্রাণতা রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এই প্রকৃতি জড়প্রকৃতি নয়, এই প্রকৃতি সচল, সজীব। বিশ্ব প্রকৃতির উদার উন্মোচন এবং অপার জীবনরহস্য থেকেই রবীন্দ্র-নাটকে মানবপ্রকৃতির প্রাণ ও প্রেরণা এসেছে,—য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের বড়ো পার্থক্য এইখানে যে, য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক নাটকে অবক্ষয়, বিষণ্ণতা, শঙ্কা বা মৃত্যুর প্রতি রয়েছে সঙ্কেতের নির্দেশ, কিন্তু "রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের অন্তিমে কোনো বিষণ্ণতার দুশ্ছেদ্য যবনিকা আর থাকে না, যবনিকা পতনের পূর্বে চিরজ্যোতির্ময় সত্য অনির্বাণ দীপশিখায় নিষ্কম্পভাবে জ্বলে ওঠে।....এটি তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকের এক নূতন বৈশিষ্ট্য, যেখানে তিনি মেটারলিঙ্ক, হাউপ্টম্যান প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র।" (ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়)।

❖ **শারদোৎসব ও ঋণশোধ ঃ** 'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বহু নাটকেই যে একটি অন্তর্নিহিত ভাব বা আইডিয়াকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং 'শারদোৎসব' (১৩১৫) নাটকে যে ভাবটিকে তিনি একটি স্থূল কাহিনির মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেছেন কয়েকবার। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ঃ "রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎ প্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ—সমস্ত খেলাধূলা ছেড়ে সে তাঁর প্রভুর ঋণশোধ করার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না এই ছেলেটার সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে, সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম!...আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে, ভয়ে কিংবা আলস্যে, কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সে-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। 'শারদোৎসবে'র ভিতরকার কথাটাই এই, ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।"—শারদোৎসবে একটি তত্ত্ব বা ভাবের সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এটিকে কোনোক্রমেই রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক বলে গ্রহণ করা চলে না। আসলে এটি ঋতু-প্রশস্তি নাটিকা—এর উপভোগ্যতার কারণ এর রোমান্টিক পরিবেশ এবং গীতিমাধুর্য। নাটকটিতে প্রকৃতির পর্যাপ্ত প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু উপনন্দ কিংবা ঠাকুরদা চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো আনন্দ সম্পর্ক গড়ে না ওঠা একটি অতৃপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।—রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে গ্রন্থটির পরিবর্তিত নাম রাখেন 'ঋণশোধ' (১৩২৬)—স্পষ্টতঃই উপনন্দের ঋণশোধই তাঁর লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

এডোয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসবে'র অভিনয় দেখে লিখেছেন, ".....the star performance of the evening was Rabindranath's own rendering of the double parts of Chandrasekhar and, later, in the mask proper, of Baul the blind bard. .....It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes. Knowing through what storms the poet's mind was passing, and what forebodings were with him, I felt as if the acting might easily be precursor of reality."

❖ **রাজা, অরূপরতন ঃ** 'রাজা' (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকৃত সাঙ্কেতিক নাটক। বৌদ্ধজাতক 'কুশজাতক' থেকে রবীন্দ্রনাথ কাহিনিটি গ্রহণ করেছেন। এই নাটকটি কবির 'খেয়া-গীতাঞ্জলি' যুগে রচিত। সমকালে কবির কাব্যে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, আলোচ্য নাটকেও সেই আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। রাজা বাস করেন অন্ধকারে, বাহিরের আলোকে তিনি কাউকে দেখা দেন না, এমনকি রানী সুদর্শনাকেও নয়। এতে রানী অতৃপ্ত, রূপের জন্য তাঁর পিপাসা, তাই বাইরের রূপের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে রানী প্রকৃত সৌন্দর্যের সন্ধান পেলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নাটকটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, " 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।"—'রাজা' নাটকের মধ্যে আমরা দুটি তত্ত্বের সন্ধান পাই,—প্রথমটি, রূপের লীলাতেই অরূপ আত্মপ্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয়টি, দুর্গম পথের মধ্য দিয়ে সত্যশিবের মন্দিরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নাটকের দুটি চরিত্র দাসী সুরঙ্গমা এবং বন্ধুস্থানীয় ঠাকুরদা কিন্তু অন্ধকারের রাজা সম্বন্ধে রানী সুদর্শনার মতো ভুল করেননি, তাঁরা রাজার রূপ ও মহিমাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। নাটকটিতে রানীর অন্তরের দ্বন্দ্ব অনেক সময়ই বাস্তবতারূপে আত্মপ্রকাশ করায় এর নাটকীয়তা বা নাট্যগুণ রয়েছে অব্যাহত। আবার রাজার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত কাঞ্চীরাজ চরিত্রটিও যথেষ্ট বৈচিত্র্য দান করেছেন, একদিকে অন্ধকার ঘরে রাজা, অপরদিকে বসন্ত প্রকৃতির উচ্ছলতা। 'রাজা' নাটকে অনেকগুলি গান রয়েছে এবং ঠাকুরদা চরিত্রের অবতারণাও নাটককে অপূর্ব কাব্যরসে সিক্ত করেছে। রবীন্দ্রতত্ত্বজ্ঞ অজিত চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, " 'রাজা' নাট্যে বসন্ত উৎসবের অবতারণা এবং ঠাকুরদার দলের অবতারণা এ নাটকের সেই লিরিক ভাগ এবং বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ।" রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'রাজা' নাটকে কিছু পরিবর্তন সাধন করে 'অরূপরতন' নামে প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তী নাটকে অঙ্কবিন্যাস এবং ভাবকেন্দ্রের পরিবর্তনে এর মূলরস কিছু ক্ষুণ্ণ রয়েছে, কারণ ব্যক্তিসত্তার উপর এতে তত্ত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'রাজা' সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 'রাজা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক ও তত্ত্বদ্যোতনার নিগূঢ় নিবিড়তায় উহা বোধহয় সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে অতুলনীয়।.....আধুনিক যুগের তত্ত্ব নাটকে যে যত বেশি তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়া স্বাধীন কল্পনার স্বয়ংক্রিয়তায় উহার আত্মিক সত্যের লীলাময়তাকে স্বীকৃতি দিতে পারে, নিগূঢ় ব্যঞ্জনার সাহায্যে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাবসত্তাকে উন্মেষিত করিতে পারে, তাঁহার হাতে তত্ত্বনাটক ততই প্রাণবেগসমৃদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক এই মানদণ্ডে অধ্যাত্ম- সাঙ্কেতিক নাটক গোষ্ঠীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে।"

❖ **অচলায়তন ও গুরু ঃ** রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটকের নামের মধ্যেই সাঙ্কেতিকতার দ্যোতনা রয়েছে। মূঢ় আচার-বিচার এবং অন্ধ কুসংস্কারই শিক্ষা-দীক্ষা বা ধর্ম-কর্মের নামে মানুষের চারদিকে বেষ্টনী গড়ে এক অচলায়তনের সৃষ্টি করে, একেই জীবনের চরম আর পরম প্রাপ্তি বলে আমরা ভ্রান্তিমোহে পতিত হই। তখন প্রকৃত গুরু এসে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে আমাদের মুক্ত করেন।—এই তত্ত্বটিই আলোচ্য নাটকের সারবস্তু। নাটকে গুরুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে কবি পরবর্তীকালে

Scanned with CamScanner

কিছু সংশোধন ও পরিবর্তনসহ এটিকে 'গুরু' নামে রূপান্তরিত করেন। 'অচলায়তন' নাটকে যেন পাশাপাশি তিনটি স্রোত ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে হতে শেষপর্যন্ত একসঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে। জ্ঞানবাদী মহাপঞ্চকের নেতৃত্বে পরিচালিত অচলায়তন ধারা, দাদাঠাকুরের প্রবর্তনায় কর্মবাদী শোনপাংশুদল এবং গোঁসাই পরিচালিত ভক্তিবাদী দর্ভকগণ—অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে গুরু এসে এদের সবাইকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। কাহিনির এই পরিণতি দেখে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, ''কবির মতে দাদাঠাকুর, গোঁসাই, গুরু—এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ; ইহাদের মধ্যে যে কোনো একটি বাদ দিলেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা হইল; কবি বলিতে চান জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়ের সাধনার সার্থকতা।''—অচলায়তনেও জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে। জড়শক্তির প্রতীক মহাপঞ্চক মহাশক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রাণশক্তির প্রতীক পঞ্চকের নিকট পরাজয় স্বীকার করেছে। নাটকটি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে 'অচলায়তন' বা 'গুরু' ''পূর্ব নাটকের ন্যায় অন্তর্গূঢ় অধ্যাত্মচেতনার কোনো সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় উদ্‌ভাসন নয়। ইহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। হিন্দুধর্মের যে মূঢ়, সংস্কারান্ধ আচার-সর্বস্বতা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উহার প্রস্তরীভূত, বস্তু সংস্পর্শহীন শূন্যতা বিকারের লক্ষণরূপে এক শ্রেণির স্মৃতিশাস্ত্র-শাসিত ধর্মব্যবসায়ীর জীবনচর্চায় প্রকট হইয়াছিল তাহাকেই নাট্যকার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্রে বিদ্ধ ও উহার অসারতা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন''।

❖ **ডাকঘর** ঃ 'ডাকঘর' (১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে এ জাতীয় রচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেটারলিঙ্ক রচিত 'Blue Bird' অপেক্ষাও 'ডাকঘর' উজ্জ্বলতর কীর্তি।—ব্যাধিজীর্ণ অমল কবিরাজের নির্দেশে এবং মোড়লের ভয়ে গৃহবন্দী, অথচ তার মন বাইরের জগতের জন্য ছট্‌ফট্ করে। দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা বা মালীর মেয়ে সুধার কাছে যখন সে বহির্জগতের খবর পায়, তখন তার মন উধাও হয়ে উড়ে চলে যেতে চায়। তারপর প্রহরীর কাছে শুনলো যে একদিন ডাকঘর থেকে তার কাছে রাজার চিঠি আসবে। অমলের বাইরের চঞ্চলতা যেন থিতিয়ে আসে, রাজার চিঠির জন্য সে অন্তরে প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকে। ঠাকুরদা তাকে আশ্বাস দেন—রাজার চিঠি আসবেই। অবশেষে মধ্যরাত্রে রাজবৈদ্য এসে জানান যে অমলকে নিয়ে যাবার জন্যে স্বয়ং রাজা আসছেন—গভীর গাঢ় ঘুমে অচেতন অমল হয়তো বা ঘুমের মধ্যেই রাজার হাতে হাত মিলিয়ে এ জগতের পথ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। শুধু সুধা একবার এসে জানিয়ে যায় যে সে অমলকে ভোলেনি।—বহুবিধ সসীমতায় আবদ্ধ মানবাত্মা এই জগৎ-সংসারের নানাবিধ বন্ধনকে ছাড়িয়ে অসীমের পথে পাড়ি দিতে চায়—অসীমের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়েই সীমা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়। রাজার চিঠির মাধ্যমে অসীমের আকাঙ্ক্ষাই শুধু ব্যক্ত হয়েছিল অমলের মনে, কিন্তু রাজার সাক্ষাৎ লাভের মধ্য দিয়ে সীমা-অসীমের মিলন সম্ভাবনাটি স্পষ্টীকৃত হল; তবে মর্ত্যমাধুরীও এখানে অস্বীকৃত নয়—সুধা যে অমলকে ভোলেনি, তার মধ্য দিয়েই মর্ত্যলোকের প্রতি আকর্ষণটিও বজায় রয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে অমলের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনের অবস্থাটিই বর্ণনা করেছেন, তিনি লিখেছেন, ''ডাকঘরে অমলের যে-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাঁহা যেন তাঁহারই বাল্যকালের রুদ্ধজীবনের কথা। রুদ্ধগৃহে বালকের চিত্ত বাহিরের প্রত্যেকটি ঘটনায় সাড়া দিতেছে। কিন্তু ভালো করিয়া দেখিবার অধিকার তাঁহার নাই ঃ নিষেধের বাধা তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কল্পনাশীল মন সমস্ত দেখিতেছে, সমস্ত যেন উপভোগ করিতেছে, বাহিরের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্তরে নিরন্তর ক্রন্দন চলিতেছে; কিন্তু সে-মিলন সম্ভব হইতেছে না। কবিরাজরূপী সংসার ও মোড়লরূপী সমাজ রহিয়াছে।''—এ শুধু রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনেরই নয়, এ ক্রন্দন বদ্ধ মানবাত্মা মাত্রেরই। 'ডাকঘর' নাটকে কোনো গান না থাকা সত্ত্বেও এমন গীতিধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের অপর কোনো নাটকেই নেই।

Scanned with CamScanner

❖ **ফাল্গুনী** : 'ফাল্গুনী' (১৩৪২) নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শারদোৎসবের মতোই প্রকৃতি রাজ্যের মধ্য থেকে এক তত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করেছেন। বসন্তোৎসবের নেতৃত্বে তরুণদল অন্ধকার গুহা থেকে জরাবৃদ্ধকে খুঁজে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। শেষপর্যন্ত যখন জরাবৃদ্ধকে আবিষ্কার করা গেল, তখন দেখা গেল, সেও যৌবনেরই প্রতীক। ঘুম থেকে যৌবনের জাগাকেও জরাবৃদ্ধ বলে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।—'ফাল্গুনী' নাটকের এটিই তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র মর্মবাণী ব্যাখ্যা করে বলেন, "জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয় চাই। যে মানুষ জয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তাঁর যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর নিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।"

"....কিন্তু পুনাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। মানুষ তাঁর জীবনকে সত্য করে, বড়ো করে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠেছে, সে ত কেবলই মৃত্যুকে জয় করে।...."

❖ **মুক্তধারা** : সাঙ্কেতিকতা এবং নাটকীয়তার যথার্থ এবং সর্বোৎকৃষ্ট মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে। নাটকটি রচনার কিছুকাল পূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল পাশ্চাত্যদেশ পরিভ্রমণে কাটিয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখস্থ আবরণ সরিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, সর্বত্র চলেছে যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের সংঘর্ষ, যন্ত্রশক্তি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে করছে বিনষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ এটিও বুঝতে পারলেন যে সবল প্রাণশক্তিই যন্ত্রশক্তির দাপটকে রোধ করতে পারে। 'মুক্তধারা' নাটকে তিনি এই তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে সমস্যা ছিল আধ্যাত্মিক কিংবা নান্দনিক, কিন্তু 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এবং 'কালের যাত্রা' নাটকে সমাজ-সচেতন কবি যান্ত্রিকতার আত্যন্তিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে মানবাত্মার জয় দেখতে চেয়েছেন। —উত্তরকূটের রাজা শিবতরাই অঞ্চলের অবাধ্য প্রজাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যন্ত্ররাজ বিভূতির সহায়তায় বাঁধ বেঁধে প্রাকৃতিক জলধারা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর পরিচালনায় প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করল। তাঁদের দাবিয়ে দেবার জন্য পাঠানো হল যুবরাজ অভিজিৎকে। অভিজিৎ সহানুভূতির সঙ্গে প্রজাদের দুঃখ-বঞ্চনাকে বুঝে নিতে চেষ্টা করলেন এবং নন্দীসঙ্কটের দিকে জলের ধারা খুলে দিলেন। তাতে উত্তরকূটের ক্ষতি হওয়াতে অভিজিৎকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে রাজশ্যালককে শিবতরাই পাঠানো হল। রাজশ্যালকের কঠোর শাসনে প্রজারা নিপীড়িত। এদিকে যুবরাজ অভিজিৎ শুড়ো মহারাজের নিকট শুনতে পেলেন যে তিনি রাজবংশের কেউ নন, কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। তিনি নিজেকেও জনগণের একজন বলে মেনে নিয়ে যন্ত্ররাজ বিভূতির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হলেন এবং শেষপর্যন্ত একদিন অভিজিৎই যন্ত্রের এক দুর্বল অংশে আঘাত করে যন্ত্রকে ভেঙে দিলেন। ঝরনার জল মুক্তধারায় প্রবাহিত হল এবং যন্ত্রের আঘাতে মৃত অভিজিৎ মুক্তধারার প্রবাহে ভেসে গেলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন, "সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'মুক্তধারা'য় সমসাময়িক সমাজমানসের চেতনা। আমাদের কালে স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমান মানুষকে কিরূপ অন্ধ ও স্বার্থলোলুপ করিয়া তুলিয়াছে, জড়-যান্ত্রিকতা মানুষের প্রাণকে লইয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব লইয়া কিভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে, মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত যন্ত্র কি করিয়া মানুষের মস্তিষ্ককে ছাড়াইয়া যাইতেছে, এ সমস্তই আধুনিক সমাজ-মনকে অন্তর্বিস্তর আলোড়িত করিতে 'মুক্তধারা' এই আলোড়নের কাব্যময়রূপ। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগকে একান্তভাবে অস্বীকার করেন না। কিন্তু যে-যান্ত্রিকতা মানুষকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ সর্বজনবিদিত। সেই বিরাগের প্রকাশ 'মুক্তধারা'য়ও আছে।" অনেকেই এই নাটকে মানব-সমাজের তিনটি স্তরের ক্রমিক

Scanned with CamScanner

বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ, কিন্তু তিনিও যন্ত্র এবং শিল্পতন্ত্রের প্রতিনিধি যন্ত্ররাজ বিভূতির হাতের পুতুল—যন্ত্ররাজ বিভূতির পরাক্রমেই প্রজাসাধারণ ও জনগণ সন্ত্রস্ত; আর অনাগত সমাজের অগ্রদূত অভিজিৎ, যে নিজের প্রাণের বিনিময়েও নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তি সাধন করবে। এই নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং তাঁর সত্যাগ্রহকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু এই সত্যাগ্রহের কোনো সার্থকতা নাটকে পাওয়া গেল না, কারণ এখানে মূল সংগ্রাম বিভূতি ও অভিজিৎ-এর মধ্যে। মুক্তধারা নাটকটির প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল 'পথ', কারণ এর সব দৃশ্যই পথে পথে অভিনীত হয়েছে—এই 'পথ' নামকরণের মধ্যে একটা অবিরাম চলা এবং গতির নির্দেশ পাওয়া যায়।

❖ **রক্তকরবী** ঃ যন্ত্রশিল্প এবং পুঁজিবাদের কবলে পড়ে মানবাত্মা যেভাবে নিপীড়িত হয়, তারই বিরুদ্ধে সক্ষোভ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটিতে। নাটকটির প্রথম নাম ছিল 'যক্ষরাজ', পরে তা পরিবর্তন করে করা হয় 'নন্দিনী' এবং সর্বশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম দেওয়া হয় 'রক্তকরবী'। মাটির তলাকার সোনার খনি, এটিই যক্ষপুরী। সেখানে জালের আবরণে রয়েছেন যক্ষরাজ সকলের অগোচরে। তারই নির্দেশে বড়ো, মেজো সর্দারগণ প্রবল প্রতাপে কাজ আদায় করে নেয় নাম-না-জানা সব শ্রমিকদের দিয়ে। একমাত্র রঞ্জনকেই ওরা শাসনে রাখতে পারে না—সব শাসনকেই সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। এরই মধ্যে এল নন্দিনী দমকা হাওয়াই মতো এক ঝলক মুক্ত বাতাস নিয়ে। তাঁর স্পর্শে সমগ্র যক্ষপুরীতেই একটা আলোড়ন জাগে। নন্দিনী রঞ্জনের সখী, সে রঞ্জনকে দিয়েছিল রক্তকরবীর মঞ্জরী—রক্তকরবী বেদনা-রক্তিম প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক, নন্দিনীর আভরণ ওই রক্তকরবী। ওই রক্তকরবীর প্রতি সকলেরই লোভ—সর্দার, অধ্যাপক, এমনকি রাজারও আকর্ষণ রক্তকরবীর প্রতি, নন্দিনীর প্রতিও। নন্দিনী আর রঞ্জন, প্রেম-সৌন্দর্য আর যৌবন শক্তির মিলন ঘটলে তাঁকে আর সামাল দেওয়া যাবে না আশঙ্কা করে সর্দাররা রঞ্জনকে বিনাশের জন্য ঠেলে দেয় যক্ষরাজের কক্ষে। কিছুই না জেনে রাজা রঞ্জনকে হত্যা করে বুঝতে পারলেন যে নন্দিনী-রঞ্জনের মিলনের মধ্যে তিনি জীবনের যে প্রশান্ত পরিণতি প্রত্যাশা করেছিলেন, নিজেরই অজ্ঞাতে তাকে তিনি বিনষ্ট করেছেন। জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন রাজা। রঞ্জনের মৃতদেহের সামনে বেদনার্ত নন্দিনীর প্রশ্নের যথার্থ উত্তর রাজার জানা ছিল না। নন্দিনীকে নিয়ে রাজা এবার নিজেরই সৃষ্টিকে ভাঙতে আরম্ভ করলেন। অনেকেই মনে করেন, যন্ত্রশিল্প এবং তজ্জাত ঐশ্বর্যের পরিবর্তে 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ কৃষিজীবনের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের সমর্থনও পাওয়া যায়। 'মুক্তধারা'র তুলনায় এতে নাটকীয় সংস্থান অপ্রতুল, নাটকীয়তাও কম। সমস্ত ঘটনা একই স্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ফলে এতে গতি-মন্থরতাও স্বাভাবিক। তাসত্ত্বেও বিশ্বসাহিত্যে 'রক্তকরবী' সাঙ্কেতিক নাটকের একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। নাটকটি বিষয়ে অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "....অভূতপূর্ব প্রতীকের ব্যঞ্জনা, তির্যক উজ্জ্বল বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, নাটকীয়তা ও গীতিরসের মূর্ছনার দ্বারা 'রক্তকরবী'তে রূপক-প্রতীকের প্রাধান্য সত্ত্বেও যে ঘটনামুখর নাট্যরস এবং যক্ষরাজ চরিত্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তা যেমন অভিনব—তেমনি বিস্ময়কর।" আধ্যাত্মিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যখন বাস্তবসমস্যা-সমাকীর্ণ সমাজ জীবনে নিবদ্ধ, তখনই তাঁর নাট্য-সাধনার চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায় প্রায় সমকালে রচিত 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটক দুটিতে। দুটি নাটকেই মোটামুটি একই ধরনের সমাজ-পরিবেশ এবং দুটিতেই রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবন-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাসত্ত্বেও নাটকীয়তা এবং অভিনয়যোগ্যতার দিক থেকে 'মুক্তধারা' পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী' অপেক্ষা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সাঙ্কেতিক তাৎপর্যের বিচারে 'মুক্তধারা' রূপকানুরঞ্জনে তুলনামূলকভাবে অনেকটা অসার্থক। এই প্রসঙ্গে 'রক্তকরবী'র উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে মনীষী

Scanned with CamScanner

অধ্যাপক সুসমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 'মুক্তধারা'র সহিত তুলনায় 'রক্তকরবী'র সাঙ্কেতিক তাৎপর্য অনেক সুষ্ঠুতরভাবে অভিব্যঞ্জিত। এখানে অন্তত তিনটি চরিত্র আছে, যাহারা রূপক-প্রভায় ভাস্বর ও সার্বভৌম সত্তায় উন্নীত— লৌহজালের অন্তরালস্থ রাজা, নন্দিনী ও রঞ্জন। রাজা তাঁহার প্রচণ্ড শক্তির ব্যর্থ প্রয়োগে আত্মদ্বন্দ্বজর্জর—তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভা শুধু বস্তুপুঞ্জসঞ্চয়ে নিয়োজিত। নন্দিনী প্রাণময় সত্তা—অতৃপ্তিপীড়িত, সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ সুস্থ আত্মবিকাশবঞ্চিত জগতে সে আশা ও আনন্দের চকিত আভাস বহন করে। .....রঞ্জন ব্যক্তিসত্তাবর্জিত, বিশুদ্ধ আনন্দসার। ...রঞ্জন ছাড়া নন্দিনী অসম্পূর্ণ; সেইজন্য রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন-আভাসে সমস্ত নাটকটি পরিপূর্ণ।"

❖ **রথের রশি ঃ** 'কালের-যাত্রা' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নামে একটি নাটিকা আছে। 'রথযাত্রা' নামে তিনি পূর্বে একখানা নাটক লিখেছিলেন, তারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ এই 'রথের রশি'। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতা এই নাটকে পূর্ণ বিকশিত। তিনি দেখিয়েছেন, পুরোহিত, রাজা, মন্ত্রী, তাদের পারিষদ্‌বর্গ—সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেও মহাকালের রথের চাকা যখন একটুও ঘুরছে না, তখন অচ্ছুত শূদ্র প্রজাদের রথের রশি স্পর্শমাত্র সেই রথ চলছে অব্যাহত গতিতে, তখন আর কোনো বাধাই তাঁকে ঠেকাতে পারছে না; রাজ-প্রসাদ, মন্দির সবই রথের চাকার তলে পড়ে ধূলাবলুণ্ঠিত হচ্ছে। নাটকটি তত্ত্বপ্রধান, কিন্তু তাসত্ত্বেও এর নাটকীয় গতি অব্যাহত। গদ্যভাষায় রচিত হলেও এই কাব্যধর্মী বাচনভঙ্গী পরম স্বাদুতা লাভ করেছে।

[ছয়] নৃত্যনাট্য

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, এগুলি তাঁর শেষ বয়সের সৃষ্টি। কথা যেখানে নৃত্য ও সংগীতের ছন্দোভঙ্গিমায় মুখরতা লাভ করে, সেখানে সৃষ্টি হয় অনির্বচনীয় আনন্দের মধুরতা। নৃত্যনাট্যের সার্থকতা নির্ভর করে নৃত্যের ওপর, অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের কোনো ব্যবহার নেই, সেখানে সংগীতই হয় ভাবের বাহন। এই নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'নটীর পূজা' এবং 'তাসের দেশ' অংশত নৃত্যনাট্য-রীতি অবলম্বনে এবং 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি সম্পূর্ণত নৃত্যনাট্য অবলম্বন করে রচিত। 'পূজারিণী' কবিতা অবলম্বনে 'নটীর পূজা' এবং কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র অতিশয় সংক্ষিপ্তরূপে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য রচিত হয়। চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদার কথাবস্তু পুরাতন হলেও যেন নতুন; অথচ চিরন্তন সত্যে দীপ্যমান।

Scanned with CamScanner